মুসলীম লীগ কী চায়?

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

নিউ এজ পাব্লিশার্স লিমিটেড
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩৫৩

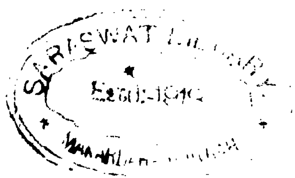
“নিউ এজ” প্রকাশিত ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের
“দি লীগ ডিম্যাণ্ড” গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ।

প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩

আট আনা

নিউ এজ পাব্লিশার্স লিমিটেডের পক্ষে জে, এন, সিংহ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

পূর্ব্বাশা লিঃ পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু
কলিকাতা সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত



মুসলীম লীগ কী চায় ?

মুসলীম লীগ চায় ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পৃথক হিন্দু ও মুসলীম দুটি অঞ্চলে ভাগ করতে। প্রত্যেকটি অঞ্চলই সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ করবে এবং নিজেদের দেশরক্ষার ব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করবে। মুসলমানেরা ভারতবর্ষে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাইরে আলাদা একটা জাতি, এই ধারণার উপরেই ঐ দাবী প্রতিষ্ঠিত। যে-সকল এলাকা লীগ এই মুসলীম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় সেগুলি হলো, উত্তরপশ্চিম প্রান্তে বেলুচীস্থান, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাব প্রদেশ এবং পূর্ব্ব প্রান্তে বাংলা ও আসাম। এই দাবীর সমর্থনে মুসলীম লীগ বলছে যে, ভারত-বিভাগের দ্বারাই দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধান হবে। এই প্রস্তাবে হিন্দুরাষ্ট্রে মুসলীম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যে-সকল রক্ষাকবচ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা দেওয়া হবে সেই ভিত্তিতেই পারস্পরিক সুবিধাদান হিসাবে মুসলীম রাষ্ট্রেও হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমপরিমাণ রক্ষাকবচ ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।

বিভ্রমের কারণ

ভারতে হিন্দু ও মুসলমানেরা পৃথক দুটো জাতি কিনা সে প্রশ্ন বিচারের আগে জাতি বলতে ঠিক কী বুঝায় সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই শব্দটি দুটি পুরাপুরি বিভিন্ন ও মূলতঃ পৃথক মনোভাব ব্যক্ত করতে ব্যবহৃত হয় বলেই অনেক সময় বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। এই মনোভাব দুটি পৃথক কারণোদ্ভুত এবং দুটি পৃথক বিষয় নির্দ্দেশক। এর একটি হলো ব্যক্তিগত জাতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা। সেটা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—যা অনেক সময় জন্মসূত্রে পাওয়া—তার উপর নির্ভর করে। এই বিশেষত্বগুলি হলো,—জাত, ভাষা ও ধর্ম্মমত। এই বৈশিষ্ট্যগুলি জাতিসঙ্ঘ অর্থাৎ লীগ অব নেশানসের ত্রিনীতিরূপে বর্ণিত এবং অনন্যনিরপেক্ষভাবে বিচার করলে তার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই একথা সি, এ, ম্যাকার্টনি বলেছেন। অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ব্রেজিল বা হনলুলুবাসী একজন জার্ম্মান বার্লিনের যে কোন একজন জার্ম্মেনের মতো জাতিতে পুরাপুরি জার্ম্মেন। কিন্তু রাষ্ট্রের দিক দিয়ে বিচার করলে 'জাতি' কথাটার মানে দাঁড়ায় একেবারে অন্যরকম।

রাষ্ট্র বলতে কী বুঝায়

বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে যে ব্যাপারগুলির সঙ্গে সবারই সম্পর্ক আছে সে-গুলি যার মারফতে চালানো হয় তাকেই

বলি রাষ্ট্র—ষ্টেট। রাষ্ট্রের অধিকারে এই ব্যাপারগুলির কতটা পড়বে সেটা শুধু যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম হয় তা নয়, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও তার তারতম্য ঘটে। কোন ক্ষেত্রে একমাত্র দেশরক্ষার ব্যবস্থার বেশী আর কিছুই রাষ্ট্রের অধিকারে নয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়া আর সব কিছুই রাষ্ট্রের আওতায় আসে। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে-সব বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত জাতি ঠিক হয় সেগুলির সঙ্গেই রাষ্ট্রের সম্পর্ক সব চেয়ে কম। বর্ত্তমানেও সেগুলিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে গণ্য করা হয়। সুতরাং জাত, ভাষা ও ধর্ম্মমত—যা নিয়ে ব্যক্তিগত জাতি নির্ণীত হয়,—তা রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে একরকম আসেই না। রাষ্ট্রের প্রধান এবং বেশীর ভাগ কাজ হলো—মাতৃভূমির নিরাপত্তা বিধান, দেশের শৃঙ্খলা রক্ষা, দুস্কৃতিকারীদের শাস্তি বিধান, পথঘাট নির্ম্মাণ, ট্যাক্স ধার্য্য করা ও কর আদায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীর পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয় ব্যাপার,—তা সে অধিবাসী যে জাতেরই হউক, যে ভাষা ভাষীই হউক বা যে ধর্ম্মমত ও অনুশাসনই অনুসরণ করুক না কেন।

এক জাত এক ভাষা

এই তথ্যগুলি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক অর্থে দুই আলাদা জাতি

বলে গণ্য হতে পারে না। ব্যক্তিগত জাত হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক হতে পারে, কিন্তু তাতে তারা আলাদা দুটি রাষ্ট্রে পরিগণিত হতে পারে না। তারা একই জাতি ও এক রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে বহু শতাব্দী ধরে, বিশেষ করে ভারতে ইংরেজ শাসনকালে বাস করে আসছে।

জাত, ভাষা ও ধর্ম্মের এবং তাদের বিকাশ ও অভিব্যক্তি যাকে সংস্কৃতি বলা হয়, সেই সংস্কৃতির মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলেও আমরা দেখতে পাবো হিন্দু ও মুসলমানেরা একই জাতি—সেটা যাই হোক। তারা একই ভাষায় কথা কয়। সে-ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে তফাৎ হয়, বিভিন্ন ধর্ম্মমত অনুযায়ী নয়। পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান ও শিখেরা বলে পাঞ্জাবী। উত্তরপশ্চিম সীমান্তে তিনজনেই বলে পুস্তু। বেলুচিস্থানে তিনজনেই বলে বেলুচী বা পুস্তু। তেমনই বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমান এবং আসামেও যে-অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী সেখানে মুসলমানেরা বাংলা ভাষাই বলে। ভারতবর্ষের এই ভাষাগুলির মধ্যে তফাৎ আছে অনেকটা। কিন্তু মুসলমানদের একান্ত নিজস্ব বা আলাদা কোন ভাষা নেই, ঠিক যেমন নেই তাদের কোন একটা নিজস্ব বংশগত জাতি যার থেকে তারা সবাই উদ্ভূত। বরং হিন্দুদের যে জাতি, যে ভাষা ও যে সংস্কৃতি তাদেরও তাই। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মমতই শুধু আলাদা।

এক জাতিত্ব

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের ব্যক্তিগত জাতি একই। এই জাতিটা বিভিন্ন প্রদেশ অনুসারে বিভিন্ন, ধর্ম্মমতানুসারে নয়। মুসলীম রাজত্ব কালে তাদের রাষ্ট্রও ছিল এক। সে-দিন রাষ্ট্র বলতে অবশ্য একজন অধিপতিকে বুঝাতো। কখনও সে ছিল নিজস্ব স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারী একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, কখনও বা দিল্লীর সম্রাট যিনি দেশের বহু অঞ্চলে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেছেন। ব্রিটিশ শাসন কালে এই এক রাষ্ট্রত্ব আরও নির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়েছে। কাজেই হিন্দু ও মুসলমানের ব্যক্তিগত জাত পৃথক হলেও একথা বলা ঠিক নয় যে, রাজনৈতিক অর্থে তারা আলাদা দুটো জাতি এবং তাদের জন্য আলাদা দুটো রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে।

বিবর্ত্তন

এই স্বল্প পরিসর স্থানে ভারতে দীর্ঘ আট শতাব্দীব্যাপী হিন্দু মুসলীম সম্পর্কের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তাদের পরস্পরের মেলামেশা ও যোগাযোগের দ্বারা যে মিলিত হিন্দুস্থানী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা শুধু একা হিন্দুরও নয় কিম্বা একা মুসলমানেরও নয়, তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়াও এখানে অসম্ভব। উভয়ের

সম্মিলিত এই সংস্কৃতির দ্বারাই একজন ভারতীয়ের সঙ্গে—তা সে হিন্দুই হউক কি মুসলমানই হউক—একজন ইউরোপীয়, একজন এমেরিকান কিম্বা একজন চীনা বা জাপানীর তফাৎ বুঝা যায়। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যে হিন্দু মুসলমানের মিলিত অবদান, উভয়ের এক কথ্য ও লিখিত ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ প্রভৃতি আচার ও রীতি নীতিতে উভয়ের মধ্যে মিল, উভয় সম্প্রদায়ের সাধক ও মহাপুরুষদের শিক্ষা দ্বারা পরস্পরের উপর প্রভাব এবং তাদের দ্বারা উভয় ধর্ম্মমতের মূল তত্ত্বনিয়ে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা এ সমস্তই একটি সর্ব্বব্যাপী সংস্কৃতি এবং হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য অধিবাসী সমন্বিত এক ভারতীয় জাতি গঠনে সহায়তা করেছে। বিদেশী শাসনের অস্তিত্ব এই এক জাতিত্বকে দৃঢ়তর করেছে। জুলিয়ান হাক্সলীর ভাষায় বলা যায়, ভারতেও "বাইরের চাপ জাতির বিবর্ত্তনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা জোরালো কারণ।"

আলাদা জাতি বলতে কি বুঝায়

তর্কের খাতিরে একবার একথা ধরেই নেওয়া যাক যে হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক অর্থে আলাদা দুই জাতি এবং বিচার করে দেখা যাক যে তার মানেটা কি দাড়ায়। প্রথমতঃ তার অর্থ এই যে ভারতবর্ষে মুসলমানেরা দেশের যে কোন অঞ্চলেই থাকনা কেন তারা একজাতির অন্তর্ভূক্ত এবং সে-জাতি হিন্দু

থেকে একেবারে পৃথক। মুসলমান অঞ্চল হিন্দু অঞ্চল থেকে পৃথক করে দেওয়ার পরে এবং হিন্দু ও মুসলীম অঞ্চল দুটি আলাদা দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরেও তারা মুসলমানই থাকবে। তাহলে হিন্দু অঞ্চলে যে-সকল মুসলমানেরা পড়ে থাকবে তাদের অবস্থা ও সত্ত্বা হবে কী? পৃথক ও স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের লোক হয়ে তারা পৃথক ও স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের লোক বা নাগরিক গণ্য হওয়ার দাবী করতে পারবে না। হিন্দু রাষ্ট্রে তারা হবে বিদেশী এবং বিদেশীদের যে-সব অধিকার ও সুবিধা পাওনা শুধু সেটুকুই পাবার অধিকারী। হিন্দু রাষ্ট্রের জনসাধারণের অধিকার তারা পাবে না। দেশের শাসনব্যবস্থায় বিদেশীদের কোন অংশ থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের চাকুরীতে তার দাবী নেই এবং আইনতঃ তাকে রাষ্ট্রের এলাকা থেকে বহিষ্কৃত করা চলে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি সূত্রে এক রাষ্ট্রের প্রজাদের অন্য রাষ্ট্রে যেটুকু সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হয় সে শুধু সেটুকুমাত্র পাবে। সে সন্ধি দ্বারা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত কয়েকটা সুবিধা দেওয়া হয় মাত্র, রাষ্ট্রের চাকুরীতে নিয়োগের অধিকার বা গভর্ণমেণ্ট পরিচালনায় অংশ কখনই দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা নির্দ্ধারিত হয় উভয়পক্ষে দেওয়া নেওয়ার মনোভাবের দ্বারা এবং যখন দুই রাষ্ট্রের পক্ষেই সে-রকম ব্যবস্থা লাভজনক তখনই তা দেওয়া হয়।

হিন্দু মুসলমান দুই আলাদা জাতি এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথক স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্রের মুসলমানেরা ও পৃথক স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রের হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও সুবিধা দাবী করতে পারবে না যদি না তারা আলাদা জাতিত্ব ছেড়ে দিয়ে যে রাষ্ট্রে বাস করছে নিজেদের সে রাষ্ট্রের জাতি বলে ঘোষণা না করে। এখন মুসলমানেরা যে সকল বিশেষ সুবিধা ও রক্ষাকবচের অধিকারী সেগুলির কোনটাই তারা পাবে না। কারণ তারা তো আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, তারা ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। ঠিক তেমনি হিন্দুরা বর্ত্তমানে যে-সকল প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে বিশেষ অধিকার ও রক্ষাকবচের সুবিধা পাচ্ছে সেগুলি থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

তর্কের খাতিরে যদি এটা ধরেই নেওয়া যায় যে, হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধিপত্রের দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের বিদেশী হিন্দু ও মুসলমানদের চাকুরী ও আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে তাহলেও মুসলমানেরা হিন্দু রাষ্ট্রে তাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশী আসন পাবে না যদি না তাদের নিজেদের রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হিন্দুদের তারা ঠিক অনুরূপ সুবিধা দিতে রাজী হয়। সন্ধিপত্রের দ্বারা বিদেশীদের এ রকম সুবিধা দানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কুত্রাপিও নেই। তা ছাড়া মুসলীম রাষ্ট্রে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা এমন যে তাতে একমাত্র উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু ছাড়া আর কোথাও এই পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে অধিক সংখ্যক আসন বা সুবিধা দেওয়া সম্ভব

নয়। কারণ হিন্দু রাষ্ট্রে হিন্দুরা মুসলমানদের যে সুবিধা দিবে, তার পরিবর্ত্তে মুসলমান রাষ্ট্রে মুসলমানেরা হিন্দুদের সে সুবিধা দেওয়ার সুযোগই পাবেনা। মুসলমানেরা বর্ত্তমানে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশী আসন ও সরকারী চাকরীর অনেক অধিক অংশ পাচ্ছে, এবং তাদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে। হিন্দুদের আলাদা নির্ব্বাচন ব্যবস্থা নেই এবং একমাত্র সিন্ধু ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও আইনসভায় তারা বেশী আসন পায়নি। আলাদা দুটি রাষ্ট্র হলে ঐ দুই প্রদেশের অল্পবিস্তর ১৪ লক্ষ হিন্দু (১২ লক্ষ ২৯ হাজার সিন্ধুতে এবং ১ লক্ষ ৮০ হাজার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে) ঐ বিশেষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু দুই তিন কোটি মুসলমান, যারা বিদেশীরূপে হিন্দু রাষ্ট্রে পড়ে থাকবে, এই সুবিধা হারাবে। বাংলাদেশে হিন্দুরা এখন তাদের সংখ্যা অনুপাতে আইনসভায় অনেক কম আসন পেয়েছে। লোকসংখ্যার অনুপাতে আসন বন্টন হলে তাদের লাভই হবে।

বিচ্ছিন্ন ভারতের দুর্ব্বলতা

পৃথিবীতে বর্ত্তমান অবস্থায় ছোট ছোট রাষ্ট্র টিকে থাকা খুবই কঠিন। প্রায় অসম্ভব বললেই হয়, দুটি বিশ্বসমর এ কথা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করেছে যে, ছোট রাষ্ট্রগুলির

অস্তিত্ব একান্ত ভাবে বড় রাষ্ট্রগুলির দয়ার উপরে নির্ভর করে। তাদের পৃথক স্বাধীন অস্তিত্ব নিরঙ্কুশ নয়। যুদ্ধের সময় তাদের স্বাধীনতা, অবিভেজ্যতা, এমন কি তাদের নিরপেক্ষতা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য হয় না। বিশ্বের রাষ্ট্রসভায় ৪০ কোটি অধিবাসী ও বিপুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও বিরাট পরিধি সমেত ভারতবর্ষ একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণের আশা রাখে। ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র ও মুসলীম রাষ্ট্রে বিভক্ত করলে সে আশা দুরাশা মাত্র। বিভক্ত রাষ্ট্র—তা সে হিন্দু রাষ্ট্রই হউক আর মুসলীম রাষ্ট্রই হউক—ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মত হবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মুসলীম রাষ্ট্রগুলি পাঞ্জাব ও বাংলার মধ্যবর্ত্তী সমুদয় অংশ ব্যাপী হিন্দুরাষ্ট্রের চাইতেও অধিকতর নগণ্য হয়ে পড়বে। ফলে একটি বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রের বদলে ভারতবর্ষে কতকগুলি ক্ষুদ্র, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত রাষ্ট্রের উদ্ভব হবে যারা বড় রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে এমন কোন সুবিধা ও অধিকার আদায় করতে পারবে না, একটি অখণ্ডিত ভারতীয় রাষ্ট্র যা পারতো।

আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার গতি হলো বৃহৎ রাষ্ট্রের অনুকুল। ফেড়ারেশান, কনফেডারেসী প্রভৃতির কথা আজকাল হামেশাই শোনা যাচ্ছে। ইউরোপ যে পরীক্ষা করেছিল তাতে দেখা গেল জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান মোটেই নয়, সে চিকিৎসা ব্যাধির চাইতেও মারাত্মক।

পৃথিবীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বহীন একেবারে পূরাপূরি একটি সম্প্রদায়ের একটা রাষ্ট্রগঠন কঠিন ব্যাপার।

প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। ভারতবর্ষেও মুসলমানহীন সম্পূর্ণ হিন্দু রাষ্ট্র বা হিন্দুহীন পুরাপুরি মুসলীম রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়।

যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতবিভাগের প্রস্তাব করা হয়েছে, বিভক্ত ভারতে সে-সমস্যা থাকবেই। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায় অত্যাচরিত হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলিতেও সে-অভিযোগ দেখা দিবে এবং সেই একই কারণে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলিকে আবার নতুন করে বিভক্ত করার দাবী উঠবে। তাদের ভিতরে একই ভাষাভাষীদের একত্র একই রাষ্ট্রে থাকবার দাবী আরও তীব্রভাবে দেখা দিবে।

অমুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত ভাগ করা হলে তারা বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নেবে না, ঠিক যেমন ইউরোপের বিভক্ত রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুরা তা স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করেনি। হিন্দু ও মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা বিপরীত প্রদেশের সংখ্যা লঘু স্বধর্ম্মীদের কাছ থেকে কেবলই সাহায্যের আহ্বানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ভারতবিভাগের ফলে কমবেতো নাই বরং বাড়তে থাকবে। পাশাপাশি রাষ্ট্রে আক্রমনাত্মক ব্যবস্থার আয়োজন ও প্রস্তুতি চলতে থাকবে এবং তার ফলে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু কোন সম্প্রদায়ের মনেই স্বস্তি থাকবে না। যে-সব বিদেশী শক্তি এই বিরোধের সুযোগ নিতে চাইবে হিন্দু ও মুসলীম রাষ্ট্রগুলি সে-সব বৈদেশিক শক্তির চক্রান্তের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। উভয় রাষ্ট্রেই শত্রুভাবাপন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক লোকের

উপস্থিতি দ্বারা নিরন্তর অশান্তি ঘটবে এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে যারা লাভবান হয়, তাদের খুব সুবিধা হবে।

সংখ্যালঘুদের অবস্থা

হিন্দু বা মুসলীম রাষ্ট্রের মুসলমানদের এ কথা ভুললে চলবে না যে, মুসলীম রাষ্ট্রে হিন্দুদের কিম্বা অমুসলমানদের সংখ্যা সমগ্র ভারতের সংখ্যালঘু মুসলীমের চাইতেই বেশী হবে ; হিন্দুরাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যার চাইতে তো অনেক বেশী হবেই। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে তাদের সংখ্যা হবে শতকরা পঁচিশ ভাগ এবং উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তেও যে জেলাগুলিতে অমুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী তাদের বাদ দিলে সংখ্যা হবে শতকরা ৩১ ভাগ। মুসলীম লীগের সভাপতির বর্ত্তমান দাবী অনুযায়ী উত্তরপশ্চিম মুসলীম অঞ্চলে গোটা পাঞ্জাব প্রদেশ ও পূর্ব্ব অঞ্চলে সম্পূর্ণ বাংলা ও সম্পূর্ণ আসাম প্রদেশ ধরলে এই মুসলীম অঞ্চলগুলিতে অমুসলমানেরা হবে যথাক্রমে শতকরা ৩৮ ও শতকরা ৪৮ জন। তাছাড়া বিভক্ত মুসলীম রাষ্ট্রের আসামে, পশ্চিম বাংলায় ও পূর্ব্বপাঞ্জাবে অমুসলমানেরা শুধু যে ঘন সন্নিবদ্ধ ভাবে বাস করছে তা নয়, তারা সংখ্যায়ও মুসলমানদের চাইতে বেশী। অথচ হিন্দুরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানেরা মাত্র শতকরা ১১ জন, তাও আবার হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ও বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের

সর্ব্বত্র তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কাজেই তুলনায় মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দুদের চাইতে হিন্দুরাষ্ট্রে মুসলমানদের অবস্থা অনেকটা দুর্ব্বল হতে বাধ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠেরা সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার করে বলে বর্ত্তমানে অভিযোগ করা হচ্ছে। সে অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে ভারতবিভাগের পর সংখ্যাগরিষ্ঠেরা সে-রকম অত্যাচার করার কারণ ও সুযোগ আরও বেশী পাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উহার অধীনস্থ বিভিন্ন অংশে দুই সম্প্রদায়ের ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়া সহজ। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে আরেকটি স্বাধীনরাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্তেও তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য ঐ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কঠিন, এমনকি একরকম অসম্ভব যদি না প্রথম রাষ্ট্রটি সেজন্য যুদ্ধের ঝুকি নিতে রাজী থাকে। কোন দেশই হেলা খেলায় আর এক দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধায় না। আধুনিক যুদ্ধও এমন যে দুটি দেশে যুদ্ধ বাঁধলে তার ফলাফল অন্যান্য দেশের উপরেও বর্ত্তায়। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বাইরের কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সহজ নয়। সচরাচর তা ঘটবেনা, সুতরাং সেটা সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি লীগ অব নেশানস্—জাতি সংঘের—আশ্বাসও ইউরোপের প্রথম যুদ্ধের পর গঠিত বিভক্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেনি এবং তার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছে।

ইউরোপের দৃষ্টান্ত

আধুনিক কালের য়ুরোপের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা যেন শিক্ষা-গ্রহণ করি ; জাতির ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক রাষ্ট্রের জন্য যেন বায়না না করি। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ভারত-বিভাগ ও জাতির ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রগঠনে নয়। বরং সে-ধরণের পৃথক রাষ্ট্র জাতি সম্পর্কে এত বেশী গোড়ামির প্রশ্রয় দিবে, তাদের রাষ্ট্রের একজাতিত্ব কায়েমী করার মনোভাবই সংখ্যালঘুদের হয় একেবারে নিশ্চিহ্ন নয়তো যথাসম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করবে। ইউরোপে ঠিক তাই ঘটেছে। সদা সর্ব্বদা ঝগড়া লেগেই থাকবে, সংখ্যালঘুদের উপর একদিকে যেমন অত্যাচার চলবে, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের উপরে রেগে থাকবে এই জন্য যে, সংখ্যালঘুদল রাষ্ট্রের প্রতি যথেষ্টরূপে মমত্বশীল ও অনুগত নয়। এই দুষ্টচক্র ভাঙ্গা কঠিন হবে। তার কারণ এই যে, তার জন্য কোন আকর্ষণ নেই বরং তার বিরুদ্ধে বহু শক্তি সক্রিয়। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা ভারতে ছোট ছোট জাতিগত রাষ্ট্রগঠনের মধ্যে খুঁজতে গেলে ব্যর্থতা অনিবার্য্য। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা হবে এক অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রগঠনে যার মধ্যে বিভিন্ন অংশগুলি যথাসম্ভব আত্মকর্তৃত্ব লাভ করবে এবং অংশগুলি তাদের নিজস্ব ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধনের সুযোগ ও অধিকার লাভ করবে।

মুসলীম লীগের দাবী অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমে পাঞ্জাব ও উত্তর পূর্ব্ব অংশে আসাম ও বাংলা প্রদেশ মুসলীম রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার দাবী যে যুক্তিসহ নয়, তা প্রমাণের জন্য সংখ্যা প্রভৃতি উদ্ধৃত করে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। সে দাবী লীগের লাহোর প্রস্তাবের মূল নীতির বিরোধী এবং একমাত্র গায়ের জোর ও যুক্তিহীন বেয়াড়া মনোভাব ছাড়া আর কিছুতেই তা সমর্থন করা যায় না। ভারতবিভাগের দাবীর যুক্তি হলো এই যে, মুসলমানেরা ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সে অঞ্চলগুলি নিয়ে তাদের জন্য পৃথক সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হোক। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কী? প্রকৃত অবস্থা এই যে, পঞ্জাবের ২৯টি জেলার মধ্যে মাত্র ১২টি ছাড়া মুসলমানরা আর কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সেখানে মোট অধিবাসীর মধ্যে তাদের সংখ্যা শতকরা ৩৩ জন মাত্র। বাংলার ২৮টি জেলার মধ্যে মাত্র ১২টিতে তারা সংখ্যায় বেশী, বাকীগুলিতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২২ জন হলো মুসলমান। আসাম প্রদেশে তারা সংখ্যা-লঘু, মোট জন সংখ্যার ৩৩ জন মাত্র মুসলমান। ১২টি জেলার মধ্যে ১১টিতে তারা সংখ্যায় কম, মাত্র ১টিতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ভারত বিভাগের দাবী যদি মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও প্রশ্ন থাকে, ঐ জেলাগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য করা হবে কেন? বিভাগের স্বপক্ষে যে-যুক্তি দেখানো হয়, ঠিক সে-যুক্তি দ্বারাই

ঐ সকল জেলাগুলিকে মুসলীম রাষ্ট্র থেকে বাদ দেওয়া উচিত। সম্পূর্ণ আসাম প্রদেশটাই মুসলিম রাষ্ট্রের বাইরে থাকবে। কলকাতায় মুসলমানেরা সংখ্যায় শতকরা ২৪ জন মাত্র। কাজেই লীগ সেটা দাবী করতে পারেনা। বর্দ্ধমান জেলা এবং সেখানকার কুয়লার খনিগুলিও পূর্ব্ব পাকিস্তানের মধ্যে পড়তে পারেনা কারণ সেখানে মুনলমানের সংখ্যা শতকরা ১৮ জন মাত্র।

বিভিন্ন অঞ্চল ও তার আর্থিক সঙ্গতি

মুসলীম রাষ্ট্রগুলির আর্থিক সঙ্গতি কী রকম দাঁড়াবে এখন একবার সে-বিষয়টা বিচার করে দেখা যাক। উত্তরপশ্চিম ও পূর্ব্ব পাকিস্তান দুইই খুব বেশী করে কৃষিপ্রধান অঞ্চল। পূর্ব্ব অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। বাংলাদেশে গড়পড়তা প্রতি এক বর্গমাইল জায়গায় ৮১৯ জন লোকের বসবাস। ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় এক বর্গমাইলে ১৫০০ লোকের বাস পর্য্যন্ত আছে। জনসংখ্যা বাড়ছে খুব দ্রুতবেগে। গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে জনসংখ্যা শতকরা ৫৪ ভাগ বেড়েছে। ৩ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ৬ কোটিতে এসে পৌছেছে। কৃষি জমির সংখ্যা সীমাবদ্ধ, তা আর বিশেষ বাড়তে পারেনা। প্রদেশের সমুদয় অধিবাসীদের উপযুক্ত চাউল বাংলায় জন্মেনা। স্যার আজিজুল হক দেখিয়েছেন যে, জনপ্রতি খাওয়ার পরিমাণ

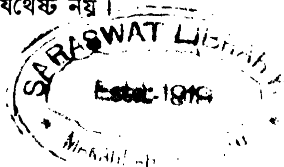
দৈনিক ১৪ ছটাক হিসাবে ধরলে বিগত ১৯২৭-২৮ সাল থেকে ১৯৩৬-৩৭ এই দশ বৎসর কালে বাংলায় যে ফসল জন্মেছে তা যথেষ্ট নয়, ঘাটতি ধানের পরিমাণ বছরে ১৬ কোটি মণ। জেলে ১২ ছটাক করে দৈনিক খাদ্য বরাদ্দ। সে-মাপ অনুযায়ী হিসাব করলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ কোটি মণ। এই হিসাবে অবশ্য শিশুরা যে পূর্ণবয়স্কদের ন্যায় সমান খাদ্য খায়না সেকথা ধরেই নেওয়া হয়েছে। চিনি, তৈলবীজ ও ডালের ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশী। আজিজুল হকই দেখিয়েছেন যে ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলা মাত্র ৬২/১ মণ সাদা চিনি উৎপাদন করেছে এবং বাইরে থেকে আমদানী করেছে ৩৫১/২ মণ। বাংলায় যে পরিমাণ ডাল প্রয়োজন তার মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং যে পরিমাণ তৈলবীজের প্রয়োজন তার মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ উৎপন্ন হয় বাংলাদেশে। ১৯৪৩ সালে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। এদিক দিয়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর অবস্থা ভালো। পাঞ্জাব তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত গম উৎপন্ন করে এবং পাঞ্জাব সিন্ধু উভয় প্রদেশেই উন্নত শ্রেণীর তুলা উৎপন্ন হয়। দুই প্রদেশের বাইরে তার চাহিদা আছে। এই প্রদেশগুলি সেচ ব্যবস্থার সুবিধা পেয়েছে এবং সেখানে কৃষির উন্নতি ও বিস্তৃতিরও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বাংলার বিরাট ঘাটতি পূরণ করা এদেরও সাধ্য নয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিপদের সময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তাড়াতাড়ি

সাহায্য পাঠানো সহজ। ১৯৪৩-৪৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হলে তা কঠিন হবে, হয়তো একেবারে অসম্ভবও হতে পারে। মুসলীম বাংলার কোনই সুবিধা নেই। তার আছে পাট। কিন্তু বাংলায় যে পাট জন্মে তার প্রায় অর্দ্ধেকটাই কিনে পাটকল যার সবগুলিই মুসলীম রাষ্ট্রের বাইরে। বাকী অর্দ্ধেকটা যায় বিদেশে। পাট অর্থকরী ফসল। তার দাম নির্ভর করে কলওয়ালা ও বিদেশে রপ্তানীর উপরে। স্যার আজিজুল হক দেখিয়েছেন যে অনেক বছর থেকেই পাট এখন আর খুব লাভজনক অর্থকরী ফসল নয়।

অধ্যাপক রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড দেখিয়েছেন যে, কাজে খাটছে এমন মজুরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতবর্ষের কলকারখানার মোট সংখ্যার শতকরা ৩৩ ভাগ আছে বাংলাদেশে কিন্তু এ কলকারখানাগুলি বেশীর ভাগই কলকাতা ও তার আশে পাশে অবস্থিত। সে-অঞ্চলগুলিতে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী, কাজেই তারা মুসলীম রাষ্ট্রের বাইরে থাকবে। তাহলে দেখা যায় যে, মুসলীম অঞ্চলে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ কলকারখানা থাকবে। বেলুচীস্থান ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কলকারখানা একপ্রকার নেই বললেই চলে। সিন্ধুর অবস্থা তার চাইতে ঈষৎ একটু ভালো। কলকারখানার দিক দিয়ে পাঞ্জাবের অবস্থাও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কিছুই নয়, এবং পূর্ব্ব পাঞ্জাবের জেলাগুলি মুসলীম অঞ্চল

থেকে বাদ দিলে তার অবস্থা আরও খারাপ হবে। পাঞ্জাবের পূর্ব্ব অঞ্চলের জেলাগুলি সবই অমুসলমান প্রধান, সুতরাং সে-গুলিকে মুসলীম রাষ্ট্রের মধ্যে ফেলা যাবেনা। দুইটি মুসলীম অঞ্চলেরই সব চেয়ে বড় অসুবিধা হলো এই যে তাদের খনিজ সম্পদ নেই। প্রায় সমুদয় কয়লার খনি ও লৌহ সম্পদই মুসলিম অঞ্চলের বাইরে। অভ্র, তামা ও অন্যান্য ধাতু সম্পর্কেও ঐ অবস্থা। একথা সবাই জানে যে এযুগে কয়লা, লৌহ ও অন্যান্য ধাতু দ্রব্য না হলে কোন রাষ্ট্রেরই চলেনা। আসামে পেট্রোল আছে, কিন্তু আসামতো পাকিস্তানে পড়বেনা। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যে পেট্রোল আছে তার পরিমাণ এখনও যথেষ্ট নয়।



আর্থিক দুর্ব্বলতা

মুসলীম অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা বিচার করলে দেখা যায় যে বেলুচীস্থান ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তাদের শাসনব্যয় নির্ব্বাহে সমর্থ নয়। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রতি বছর প্রায় দুই কোটি টাকার মতো সাহায্য তাদের দিতে হয়। কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও সিন্ধু ঠিক ঐ রকম ঘাটতি প্রদেশ ছিল। পাঞ্জাব বা বাংলা তাদের নিজেদের খরচ একরকম করে চালিয়ে নিতে পারে, কিন্তু আসামকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ভারত বিভাগের

পর কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরপশ্চিম ও পূর্ব্ব মুসলীম অঞ্চলগুলির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবেনা। ঘাটতি প্রদেশগুলিকে হয় পাঞ্জাব ও বাংলার রাজস্বের উপর নির্ভর করতে হবে, নয়তো প্রদেশগুলিতে নতুন করধার্য্য করে রাজস্ব বাড়াতে হবে। ঘাটতি প্রদেশগুলিতে জাতি গঠনমূলক কোন কাজে হাত দেওয়া চলবেনা, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হবেনা এবং ঐ প্রদেশগুলিকে সাহায্য করার ভার যখন বাংলা এবং পাঞ্জাবের উপরে পড়বে তখন তাদেরও নিজেদের গঠনমূলক কাজে ব্যয় করার মতো অর্থের অভাব ঘটবে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে তাদের নিজেদের লোক লস্কর, জাঁকজমক রাখতেই হবে। কেন্দ্রীয় সরকার আজকাল ঐ প্রদেশগুলি থেকে যে রাজস্ব সংগ্রহ করে ভারতবিভাগের পর সে অর্থটা অবশ্য মুসলীম অঞ্চলের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার জন্য ব্যয় হতে পারবে। কিন্তু সে-টাকায় যুদ্ধের আগে যে ধরণের দেশরক্ষার আয়োজন ছিল তার ব্যয় সঙ্কুলানও সম্ভব নয়,—আধুনিক কালের উন্নতধরণের দেশরক্ষা ব্যবস্থার কথা দূরে থাকুক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যে হারে দেশরক্ষার জন্য ব্যয় করা হতো সে হারেও মুসলীম রাষ্ট্রের দেশরক্ষার খরচ জনসংখ্যার মাথাপিছু হিসাবে ধরলে ঐ প্রদেশগুলির রাজস্বে প্রায় পাঁচ ছয় কোটি টাকা ঘাটতি পড়বে।

উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ব মুসলীম অঞ্চলগুলি ভারতের সীমান্ত ভাগে অবস্থিত। এটা জানা কথা যে সেগুলিতেই কেন্দ্রীয়

সরকারের দেশরক্ষার ব্যয় বাবদে খরচ হয় সবচেয়ে বেশী। মাথাপিছু হারের চাইতে সে খরচ অনেক বেশী। সুতরাং ঘাটতির পরিমাণও অনেক বেশী হবে। অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড বলেছেন, "একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গীভূত থেকে ঐ প্রদেশগুলি যে নিরাপত্তা ভোগ করেছে, পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়ে তারা তা পাবে না। দেশরক্ষার নিম্নতম প্রয়োজন মিটাতে যে বিপুল অর্থব্যয় প্রয়োজন তাতেই পাকিস্তানের সমুদয় আর্থিক সঙ্গতি শুষে নেবে, জনসাধারণের অবস্থা উন্নতির জন্য ব্যয় করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবেনা।"

জাতীয় ঋণের সমস্যা

সার্ব্বভৌম পৃথক মুসলীম রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা বিচারে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। গতযুদ্ধে ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ভয়ানক বেড়ে গেছে। বর্ত্তমানে সে ঋণের পরিমাণ প্রায় ২০০০ কোটির কাছাকাছি। মুসলীম রাষ্ট্র পৃথক হলেই তাকে ঐ ঋণের অংশ নিতে হবে। জনসংখ্যার হিসাবে ঐ অংশের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০০ কোটি টাকা। শতকরা তিনটাকা সুদে বছরে তার জন্য সুদই দিতে হবে ১৫ কোটি টাকার। দেশরক্ষার জন্য মুসলীম প্রদেশগুলিতে যুদ্ধের আগের হারেও যে ব্যয় হবে তার ফলে তাদের ঘাটতির

পরিমাণ পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকা এর সঙ্গে যোগ করলে দাড়ায় ২০ কোটি টাকা। তার মানে মুসলীম রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশগুলিকে ঐ পরিমাণ বেশী টাকা তুলবার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের পরবর্ত্তী হারে ঐ ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশী হওয়ারই সম্ভাবনা। যে-সকল প্রদেশের মোট রাজস্বই হলো ২৬ থেকে ২৭ কোটি টাকার মতো তাদের পক্ষে আরও ২১ কোটি টাকার রাজস্ব বাড়ানো একেবারেই অসম্ভব।

সুতরাং দেখা গেল ভারতবিভাগের প্রস্তাব যুক্তিসহ নয়। ভারতবিভাগের যে উদ্দেশ্য—সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান—তা সিদ্ধ হবেনা, কারণ হিন্দু ও মুসলীম উভয় রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু লোক রয়ে যাবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে যে অবস্থায় থাকতো, ভারতবিভাগের ফলে হিন্দু ও মুসলীম রাষ্ট্রে তার চাইতেও অনেক খারাপ অবস্থায় পড়বে।

মুসলীম রাষ্ট্রে অ-মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী, তারা নানা জায়গায় ছড়ানোও নয়। কাজেই তারা হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চাইতে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় থাকবে, নিজেদের স্বার্থরক্ষায় তারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর শক্তিশালী হবে। হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে সন্ধিসূত্রে তাদের এলাকায় মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধাদানের কোন আকর্ষণ নেই, কারণ মুসলমান রাষ্ট্রে হিন্দুদের জন্য

অনুরূপ সুযোগ সুবিধাদান মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়। কৃষি ও শিল্পের অবস্থা মুসলীম রাষ্ট্রে মোটেই সন্তোষজনক হবেনা। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল কৃষির দিক দিয়ে পূর্ব্ব অঞ্চলের চাইতে কিছুটা ভালো অবস্থায় থাকবে, কিন্তু কলকারখানার দিক দিয়ে দুই অঞ্চলের অবস্থাই সমান হতাশাব্যঞ্জক। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কতকগুলি প্রদেশের ঘাটতি মেটাবার দায় পড়বে পাঞ্জাবের উপরে।

দেশের ক্ষতি

প্রদেশগুলি যদিবা কোন মতে নিজেদের খরচ চালিয়ে নেয়, তাদের নিজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তারা যে অর্থ পাবে সে অর্থে যুদ্ধপূর্ব্ব হারে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, বর্ত্তমান ব্যয়বহুল ব্যবস্থার কথাতো ছেড়েই দিলাম।

জাতীয় ঋণের যে অংশ বিভক্ত মুসলীম রাষ্ট্রের ঘাড়ে পড়বে সে টাকাটা ও দেশরক্ষার খরচ মিলিয়ে তাদের উপরে যে চাপ পড়বে তাতে তারা গুড়িয়ে যাবে, জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি-সাধনের লেশমাত্র আশা থাকবেনা। সমস্ত প্রস্তাবটাই নিছক রাগ ও উত্তেজনার মাথায় করা এবং সেটা কার্য্যে পরিণত করলে সমগ্র দেশেরই অকল্যাণ হবে। বিভক্ত অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু হিন্দুদের চাইতেও মুসলমানদেরই অনিষ্ট হবে অধিকতর।